গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২৮ সংখ্যা | ২ - ৮ এপ্রিল ২০২১ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com | আট পাতা | পৃ. ১

দিল্লি বিল চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক

প্রভাস ঘোষ

কেন্দ্রের মোদি সরকার লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক দিল্লি বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। 'ন্যাশনাল ক্যাপিট্যাল টেরিটরি অব দিল্লি (অ্যামেডমেন্ড) বিল-২০২১' এর তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই বিলে বলা হয়েছে, কেন্দ্রের প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অনুমতি ছাড়া দিল্লি রাজ্যের নির্বাচিত সরকার কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারবে না। সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজও যতটুকু গণতন্ত্রের অবশেষ আছে, নির্বাচিত সরকারকে আমলাতন্ত্রের অধীনস্থ করার মধ্য দিয়ে তাকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, বিচার-বিভাগ, এমনকী নির্বাচিত সরকারকেও রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করা শাসক বিজেপির ফ্যাসিবাদী চক্রান্তেরই অন্যতম অঙ্গ। এর পরিণাম ভয়ঙ্কর।

গণতন্ত্র ধ্বংস এবং ফ্যাসিস্ট স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সব রকম চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

মায়ানমারে গণহত্যার তীব্র নিন্দা এসইউসিআই(সি)-র

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, মায়ানমারের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করে সেখানকার সামরিক জুন্টা যেভাবে নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে ও শত শত মানুষকে আহত করছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।

অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেখানকার যে নির্বাচিত সরকারকে সামরিক বাহিনী ক্ষমতাচ্যুত করেছে, সেই সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে মায়ানমারে নাগরিকরা পথে নেমেছেন। নিরীহ নাগরিকদের ওপর রক্তপিপাসু ফ্যাসিস্ট মিলিটারির এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার গণতন্ত্রকামী মানুষ দ্ব্যর্থহীনভাবে ধিক্কার জানাচ্ছে। অথচ ভারত সরকার আজ পর্যন্ত এই গণহত্যার বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি পর্যন্ত প্রকাশ করল না। শুধু তাই নয়, গত ২৭ মার্চ, যেদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে আন্দোলনরত ১১৪ জন নাগরিকের মৃত্যু হয় এবং মোট মৃতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়ায়, সেদিনই অভ্যুত্থানকারী সেনাকর্তাদের একটি সামরিক মহড়ায় যোগ দেয় ভারত। যথার্থভাবেই মায়ানমারের নাগরিকরা এই ঘটনায় তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, 'আমাদের রক্তে যে সেনাকর্তাদের হাত ভেজা তাদের সঙ্গে ভারত সরকারের এই হাত-মেলানো শুধু যে ভারতবাসীদের জন্য অসম্মানজনক তাই নয়, গোটা বিশ্বের মানুষের জন্যই লজ্জার।'

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীদের প্রতি আমাদের আহ্বান, মায়ানমারের সংগ্রামী ভাইদের প্রতি সংহতি জানিয়ে তাদের পাশে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়ান এবং ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন যাতে তারা কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে মায়ানমারের সামরিক বাহিনীকে এই বর্বরতা বন্ধ করে নির্বাচিত সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে।

'পিএম কেয়ার্স' কাদের কেয়ারের জন্য?

ট্রাস্টের নাম 'পিএম কেয়ার্স'। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অমিত শাহ সহ তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন ট্রাস্টি বোর্ডে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার তহবিল থেকে তাতে টাকা ঢালা হয়েছে। সরকারি কর্মীদের বেতন থেকেও কার্যত গায়ের জোরে টাকা কেটে দেওয়া হয়েছে এই তহবিলে। শত শত কোটি টাকা ঢেলেছে দেশের বেসরকারি সংস্থাগুলিও। তহবিলের নাম এবং তা ভরাতে সরকারি তৎপরতা যতই থাকুক না কেন, এটি নিয়েই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা— আদৌ কি এটি সরকারি তহবিল?

প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত এই তহবিল নথিভুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগে। অথচ এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এটি কোনও সরকারি ট্রাস্ট নয়। কেন্দ্র কিংবা কোনও রাজ্য সরকার এই তহবিল বা দানের

দুয়ের পাতায় দেখুন

কুলতলির এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের সমর্থনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠে পথসভা। ২৪ মার্চ

গদির জোরে নয়, আন্দোলনের পথেই একের পর এক দাবি আদায়

(দ্বিতীয় পর্ব)

রাজ্যে সরকার গঠনের মহারণ চলছে। সরকার যেমনই হোক একটা হবেই। আমাদের দেশে বা রাজ্যে আর যাই হোক, সরকারের অভাব কোনও কালেই ঘটেনি। কিন্তু অভাব যেটা দেখা গেছে তা হল, বিধানসভার ভেতরে সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কে লড়বে। এতদিন বিধানসভার ভেতরে এই লড়াইটা লড়েছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। বাইরেও তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। জনগণের ন্যায্য দাবিতে বার বার শ্রমিক চাষি ছাত্র যুবক মহিলা লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আন্দোলনের চাপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায়ও হয়েছে। গত সংখ্যায় শ্রমিক কর্মচারীদের কিছু দাবি আদায়ের সংবাদ আমরা ছাপিয়েছি। এই সংখ্যায় থাকছে ছাত্র সংগঠনএ আই ডি এস ও-র কিছু দাবি আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

আন্দোলনের ফলে ফি কমেছে

২০১৮ সালে উত্তর কাঁথির করলদা হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণিতে ফি ধার্য হয়েছিল ২,৮০০ টাকা। এ আই ডি এস ও-র আন্দোলনে তা ২০০০ টাকা কমে যায়। ২০১৬ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কুঞ্জরানী বাণীভবন হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণিতে কম্পিউটারে ধার্য ফি ১২০০ টাকা পুরোপুরি মকুব হয়। পাঁশকুড়া বনমালী কলেজে ভর্তি ফি ২০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ কমেছে। এ বছর নারায়ণগড় ব্লকে লালবাহাদুর শাস্ত্রী বিদ্যাপীঠ উন্নয়ন ফি বাবদ আদায় করা ৩০০ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়। ২০১৯ সালে খড়্গপুর কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে ফি ১০০০ টাকা থেকে কমে ৫০০ টাকা হয় এআইডিএসও-র আন্দোলনে। ২০২০ সালে মুর্শিদাবাদ ডি এন কলেজে দ্বিতীয় সেমেস্টারে ফি ১০০০ টাকা থেকে কমে ৫০০ টাকা হয়। তৃতীয় বর্ষে ফি কমে ৭০০ টাকা। এই জেলার বি কে হাইস্কুলে ধার্য রেজিস্ট্রেশন ফি পুরোপুরি মকুব হয়। সাদিকপুর হাইস্কুলে ২৬০ টাকা ফি কমে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র আন্দোলনের ফলে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার এনরোলমেন্ট ফি প্রত্যাহার হয়।

রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র আন্দোলনের ফলে ফি কমেছে, কোথাও কোথাও পুরোপুরি প্রত্যাহৃত হয়েছে। নির্বাচিত সরকার শিক্ষায় এত কম বরাদ্দ করে যে, কর্তৃপক্ষ অনেক সময় বাধ্য হয়ে ফি ধার্য করেন। এই হল বর্তমান ও পূর্বেকার সরকারের ভূমিকা। জনগণকে আজ ভাবতে হবে কে জিতলে তার লাভ? কার শক্তি বাড়ালে তার লাভ?

দুয়ের পাতায় দেখুন

‘পিএম কেয়ার্স’

একের পাতার পর

বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে না। এদিকে আবার সরকার বাহাদুর ২০২০-র ডিসেম্বরে জানায় এটি সরকারি তহবিল, কিন্তু তা তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় নয়। অর্থাৎ দেশের নাগরিকরা এই তহবিল সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়ার অধিকারী নন। পিএম কেয়ার্সের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই সরকারি হিসাব পরীক্ষক সংস্থা সিএজি-র। জাতীয় ত্রাণ তহবিল থাকা সত্ত্বেও করোনা অতিমারি মোকাবিলার নামে প্রধানমন্ত্রী লকডাউনের মধ্যে ২৭ মার্চ’২০ যখন পিএম কেয়ার্স ফান্ড তৈরি করেন, তখনই এর পিছনের উদ্দেশ্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল।

সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারেই যেটি সরকারি ট্রাস্ট নয়, সেটি নথিভুক্ত হওয়ার পরের দিনই কেন্দ্রীয় কর্পোরেট মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, কর্পোরেট সংস্থাগুলির সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে যে খরচ করার কথা, সেই ‘কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি’র (সিএসআর) টাকা পিএম কেয়ার্সে দিতে পারবে। যদিও কোম্পানি আইনে পরিষ্কার লেখা আছে, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল, ত্রাণ তহবিল, তফশিলি জাতি, জনজাতির উন্নয়ন তহবিলেই কেবলমাত্র সিএসআর-এর টাকা গ্রহণ করা যায়। পিএম কেয়ার্স তৈরি করে সরকার বলেছিল করোনা মহামারি জনিত যে কোনও ধরনের জরুরি পরিস্থিতি সামলাতে, দুর্গতদের সাহায্য দানে এই তহবিল ব্যবহৃত হবে। পিএম কেয়ার্স তহবিলের গঠন নিয়েই শুধু ধোঁয়াশা রয়েছে তা নয়, একই রকম অস্বচ্ছতা তার খরচের বিষয়েও। কোথায় কোন বিষয়ে এই ফান্ড থেকে খরচ করা হল, করোনা জনিত কারণে ক্ষতির সম্মুখীন কোন ব্যক্তি সাহায্য পেলেন, দেশের কোটি কোটি কাজ হারানো শ্রমিকরা, করোনায় স্বজন হারানো একটিও দরিদ্র পরিবার সাহায্য পেয়েছেন কিনা কিছু জানার সুযোগ রাখেনি কেন্দ্রীয় সরকার। তা হলে কেন এত গোপনীয়তা? সরকারের নামে চলা এই তহবিলের স্বচ্ছতা থাকবে না কেন? তবে কি সরকারের নামে ফান্ড খুলে বিপুল পরিমাণে টাকা তুলে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে খরচ করা হবে?

কী পরিমাণ টাকা জমা পড়েছে এই তহবিলে? ফান্ড তৈরি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে জমা পড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা। গত বছরের ৩১মে পর্যন্ত জমা পড়া টাকার পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি ফান্ডে জমা দিয়েছে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ৫০০ কোটি, টাটা গোষ্ঠী ৫০০ কোটি, আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী ৪০০ কোটি, আদানি গোষ্ঠী ১০০ কোটি। এ ছাড়া মাহিন্দ্রা গোষ্ঠী, টেক মাহিন্দ্রার মতো বেসরকারি সংস্থার তরফেও বিপুল অনুদান জমা পড়েছে এই তহবিলে। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ ৮০কোটি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ৭০ কোটি টাকা দিয়েছে। ইয়েস ব্যাঙ্ক এই তহবিলে ঢেলেছে ১০কোটি টাকা এবং কর্মীদের একদিনের বেতন থেকে কেটে ১.৯ কোটি টাকা দিয়েছে। বেসরকারি অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কও কর্মীদের মাইনে থেকে কেটে টাকা দিয়েছে, আরও ১০০ কোটি টাকা তারা এই কাজের জন্য আলাদা করে রেখে দিয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির তহবিল থেকে মোট ২১০৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এই ফান্ডে। কিছু বিদেশি অনুদানও এই ফান্ডে এসেছে বলে শোনা গেছে। প্রসঙ্গত, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্ক এই বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন কর্তারা নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। কর্তাদের দুর্নীতিতে দেউলিয়া হতে বসা ইয়েস ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রচুর টাকা ঢালতে হয়েছে। আম্বানি, আদানি গোষ্ঠী লকডাউনকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে বিপুল সম্পদ কার্যত লুঠ করেছে তাও দেশের মানুষের অজানা নয়। এই সমস্ত ধনকুবেরের দল এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের লুঠেরা পুঁজিপতিরা সরকারের নামে চলা কার্যত বিজেপি নেতাদের ফান্ডে ‘কেয়ার’ দানের জন্য কেন এত উঠেপড়ে লেগেছে তা বুঝতে কোনও বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। জনগণের সর্বস্ব লুঠের কারবারে সরকারকে পাশে পেতে, জলের দরে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি হাতাতে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা ঋণ আত্মসাৎ করেও বুক ফুলিয়ে আবার ঋণ চাইতে, ট্যাক্স ছাড়ে স্বর্গরাজ্যের সুবিধা পেতে, বিনিয়োগের নামে সব নিয়ম কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর কাজে সরকারের বদান্যতা পেতেই কি পিএম কেয়ারে টাকা ঢালার ব্যবস্থা?

সব কিছু দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক ‘পিএম কেয়ার’ মানে হল বিজেপি কেয়ার। এমনিতেই দেশের একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের সবচেয়ে বড় পছন্দের তালিকায় এখন আছে বিজেপি। এই ধনকুবের কর্পোরেট মালিকদের বদান্যতায় বিজেপির ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে, ২৯০৪ কোটি টাকা (২০১৮-১৯ সালে)। এছাড়াও কালো টাকার আশীর্বাদ তো বিজেপির দিকে আছেই। টাকার পাহাড়ে বসে থাকা বিজেপি নেতারা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে প্রায় রিক্সা ট্যাক্সির মতো করে হেলিকপ্টার আর চার্টার্ড প্লেন ব্যবহার করে চলেছেন। তাঁরা ক্যামেরার সামনে গরিবের দাওয়ায় বসে ভাত খাচ্ছেন, কিন্তু আসলে তাঁরা মহার্ঘ পাঁচতারা হোটেলের বাসিন্দা। পিএম কেয়ারের তহবিলের অস্বচ্ছতার সুযোগে এই খরচের একটা অংশ ঘুরপথে ওই ফান্ড থেকে আসছে কি না, তা বিজেপি নেতারাই ভাল বলতে পারবেন। তবে সাদা টাকায় যে এই বিপুল খরচ সম্ভব নয়, সেটা বোঝার জন্য অর্থনীতিতে পিএইচডি হওয়ার দরকার হয় না। ভোটের বাজারের দেশ সেবকরা আসলে পুঁজিপতিদের সেবক। ‘পিএম কেয়ার্স’ আসলে পুঁজিপতিদের কেয়ারে বিজেপি নেতৃত্বের উদ্ভাবন বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

পানীয় জলের দাবিতে
পদ্মের হাটে পথ অবরোধ, দাবি আদায়

২৯ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর বিধানসভার পদ্মের হাটে মহিলারা পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন। তাদের দাবি, গত দুই বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যায় তাঁরা বিপর্যস্ত। সব জানা সত্ত্বেও প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। মহিলারা আওয়াজ তোলেন, প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এরপর জয়নগর থানার আইসি এসে প্রতিশ্রুতি দেন আগামী দশ দিনের মধ্যে একটা কমিটি গঠন করে জলের লাইন পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হবে এবং যতদিন ব্যবস্থা না হচ্ছে প্রতিদিন জলের গাড়ি পাঠানো হবে। পিএইচই-র স্থানীয় কর্তারা গ্রামের মধ্যে দুটি জলের ট্যাঙ্ক বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতির পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন শাহানা মোল্লা, খাদিজা বিবি, সাজিদা মোল্লা প্রমুখ।

আন্দোলনের পথেই দাবি আদায়

একের পাতার পর

অন্যান্য আন্দোলনে দাবি আদায়

শুধু ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধেই নয়, আরও বহু আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে।

- জলপাইগুড়ি জেলার রানীনগর হাইস্কুলে সাইকেল বিতরণে কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এআইডিএসও আন্দোলন গড়ে তোলে। কর্তৃপক্ষ পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়েও আন্দোলন দমাতে পারেনি। অবশেষে সাইকেল বিতরণ করতে বাধ্য হয়।
- কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে মডেল প্রশ্নপত্র প্রকাশের দাবিতে এআইডিএসও-র আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।
- কলকাতা শ্যামাপ্রসাদ কলেজে অনৈতিকভাবে টাকা আদায় হচ্ছিল করোনা পরিস্থিতির মধ্যে। এআইডিএসও-র আন্দোলনে কর্তৃপক্ষ সেই টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অধীনস্থ কলেজগুলিতে এআইডিএসও-র আন্দোলনে অসম্পূর্ণ ফল দ্রুত প্রকাশ হয়েছে। সেমিস্টার ফি মকুব হয়েছে।
- দক্ষিণ দিনাজপুরে ২০১৭ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের বই দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করে এআইডিএসও। তার ফলে ডিএম বই দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্যারামেডিকেল ছাত্র আন্দোলনে জয়

- সরকারি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্যারামেডিকেল ছাত্রদের কলেজের ছাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করত। রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্যারামেডিকেল ছাত্রদের ছাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন।
- আন্দোলনের ফলে প্যারামেডিকেল ছাত্রদের লাইব্রেরি ফেসিলিটি দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।
- আন্দোলনের ফলে প্যারামেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশিপ স্টাইপেন্ড মাসিক ৫০০ টাকা বেড়ে ২০০০ টাকা হয়। আন্দোলনের দাবি ১২,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড করতে হবে।
- প্যারামেডিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্য এন্ট্রান্স পরীক্ষা চালু হয়।
- দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার প্যারামেডিক্যাল অ্যালায়েড বিল ২০১৫ সালে পাশ করাতে বাধ্য হয়।
- অষ্টম শ্রেণি ও দশম শ্রেণি পাশ করেই প্যারামেডিক্যাল কোর্স পড়ার কালা সার্কুলার এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় ও পরে তা বাতিল হয়।
- আন্দোলনের দাবি ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী প্যারামেডিকসদের ল্যাটেরাল এন্ট্রির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় সুযোগ দিতে হবে। ২০২০ সাল থেকে হেলথ ইউনিভার্সিটি প্রথম ল্যাটেরাল এন্ট্রি চালু করেছে।
- রাজ্যব্যাপী দীর্ঘ আন্দোলন ও একাধিক বার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের পর এক দশকেরও বেশি সময় পর ২০১৭ সাল থেকে মেডিকেল টেকনলোজিস্টদের সরকারি নিয়োগ শুরু হয়েছে।

এই হল আন্দোলনের গুরুত্ব। নির্বাচিত সরকার এগুলি উপেক্ষাই করে গেছে। পাঠক ভাবুন, নির্বাচনে কাকে শক্তিশালী করা দরকার।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীরা উদযাপন করবে তার ৭৫ বর্ষ!

পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যে ভোট ঘোষণা হতেই বিজেপি জাতীয়তাবাদের হাওয়া তুলতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭৫ বর্ষ উদযাপন করার কথা ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের কী প্রত্যাশা ছিল, কী প্রাপ্তি ঘটল ইত্যাদি বিষয় আজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার বিষয়। সেগুলি এস ইউ সি আই (সি) অবশ্যই আলোচনায় আনবে। কিন্তু যে প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়ে আজ ভাবার তা হল বিজেপি যে সংগঠনের আদর্শ মেনে চলে, সেই আরএসএস স্বাধীনতা আন্দোলনে কী ভূমিকা নিয়েছিল। যখন ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী, আসফাকউল্লার মতো তরুণেরা মুক্তির মন্দির সোপান তলে আত্মবলিদান দিয়েছেন, আরএসএস কর্মী-নেতারাও কি তা করেছেন?

স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আর এস এস-এর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তাদের গুরু এম এস গোলওয়ালকর বলেছিলেন, "ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ভাবা হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছিল" (চিন্তাচয়ন, ১ম খণ্ড, পৃ ঃ ১২৫)। লক্ষ করুন আর এস এস-এর কাছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একটি 'প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন'। তা হলে, আর এস এস সদস্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ কোনও বিজেপি নেতা স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপনের অধিকারী হতে পারেন কি?

আর এস এস ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেই স্বীকার করে না। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-পারসিক-খ্রিস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শত-সহস্র বছরের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এবং পরিশেষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে একই শোষণ-যন্ত্রণা, একই অত্যাচার-বঞ্চনার শিকার হওয়ার কারণে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে ভারতের গড়ে ওঠাকেই তারা স্বীকার করে না। তাদের মতে, "আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, সব কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা। এর অর্থ কেবল হিন্দুরাই এই মাটির সন্তান হিসেবে এখানে বসবাস করেছে" (গোলওয়ালকর, চিন্তাচয়ন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩-২৪)। আর এস এস-এর এই বক্তব্য বিবেকানন্দের চিন্তার, রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'কোনও সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোনও জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ছাড়াই যে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ একটি জাতিও জগতে নাই।" (বিবেকানন্দ রচনাবলি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "ভারতবর্ষের কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়" (রবীন্দ্র রচনাবলি, ১৪ শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯, বিশ্বভারতী সংস্করণ)। ৭৫ বর্ষ উদাযাপনের সমারোহে দেশকে মাতানোর আগে নরেন্দ্র মোদি সাহেব বলুন— কে ঠিক, রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ না আরএসএস?

বিজেপি দেশভাগের জন্য একতরফা ভাবে মুসলিম লিগ ও মুসলিম মৌলবাদী শক্তিগুলিকেই দায়ী করে। কিন্তু দেশভাগের জন্য মুসলিম লিগের সাথে হিন্দু মহাসভাও দায়ী। প্রতিষ্ঠার ৩৪ বছর পর ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে মুসলিম লিগ মুসলিমদের জন্য পৃথক দেশের দাবি তোলে। কিন্তু তার ১৭ বছর আগে ১৯২৩ সালেই হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকার ধর্মভিত্তিক পৃথক জাতির ধারণা উপস্থিত করেছিলেন। তিনি 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলিম দুটি পৃথক জাতির তত্ত্ব পেশ করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, "সাম্প্রদায়িক পথে ভারত বিভাগের ধারণাটির উদ্ভাবনের জন্য বিপুল পরিমাণে দায়ী হল হিন্দু মহাসভা"। তিনি আরও বলেছেন, "মুসলিম লিগ সাভারকারের ওই বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিল"। ফলে ভারতভাগের জন্য এবং উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি ও নাগরিকত্বের সংকট সৃষ্টির জন্য হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদ উভয়ই দায়ী।

আর এস এস-এর মতে অসহযোগ আন্দোলন অশুভশক্তির জাগরণ

ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন গোটা দেশে ১৯২১-২২ সালে তীব্র রূপে ফেটে পড়েছিল। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত পার্থক্য গৌণ করে হাজার হাজার মানুষ এক হয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বাসন্তী দেবী, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতা সহ হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই গণসংগ্রামের মধ্যে আর এস এস প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার দেখতে পেলেন 'অশুভ শক্তির জাগরণ'। হেডগেওয়ারের ভাষায়, ...অসহযোগের দুগ্ধ পান করে বেড়ে ওঠা যবন-সর্প তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে দেশে দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছিল" (ভিশিকার-১৯৭৯, পৃঃ ৭)। এই ছিল অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে হেডগেওয়ার-এর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের নামে প্রহসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহ, ওই বছরের ২৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘট — আর এস এস এই সমস্ত আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেছে অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে গোলওয়ালকর এও পর্যন্ত বলেছিলেন— "এই সংগ্রামের খারাপ ফল হতে বাধ্য।" এহেন আর এস এস-এর চিন্তাকে পরাধীন ভারতের জনগণ গ্রহণ করলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন পিছিয়ে যেত।

১৯৩০ সালে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের সময় আরএসএসের ভূমিকা কী ছিল? আরএসএস প্রকাশিত এক জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে— "১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলেন। ... ডাঃ হেডগেওয়ার সব জায়গায় খবর পাঠালেন সংঘ এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করবে না। সে যাই হোক ব্যক্তিগত ভাবে যারা অংশগ্রহণ করতে চাইবে তাদের বাধা দেওয়া হবে না। এর অর্থ হল সংঘের কোনও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না" (সিপি ভিশিকর, সংঘবিকাশ কে বীজ, ডাঃ কেশব রাও হেডগেওয়ার, নিউ দিল্লি, পৃ ঃ ২০)।

তাহলে ডাঃ হেডগেওয়ার নিজে ব্রিটিশ কারাগারে গিয়েছিলেন কী উদ্দেশ্যে? হেডগেওয়ার জেলে গিয়েছিলেন হীন উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর জীবনীগ্রন্থ বলছে, "ডাক্তার সাহেবের এই প্রত্যয় ছিল জেলের ভিতর তিনি একদল স্বদেশপ্রেমী, অগ্রগামী, নামজাদা লোক পাবেন। তাঁদের সাথে তিনি সংঘ নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন এবং সংঘের কাজে তাঁদের টেনে আনতে পারবেন" (ঐ)।

অর্থাৎ, স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে হেডগেওয়ার জেলে যাননি, তিনি জেলে গিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সরিয়ে দিতে। এর পরেও বিজেপি কোন লজ্জায় স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পালন করে?

স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু মহাসভার ভূমিকা কী ছিল? যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে সেই প্রসঙ্গে বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯৪১ সালে ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনে বলেন, "ভারতের প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে, ভারত সরকারের অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের সমস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতিকে হিন্দুদের অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করতে হবে। ...হিন্দুদের বৃহৎ সংখ্যায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে হবে" (সাভারকর সমগ্র, খণ্ড-৬, মহারাষ্ট্র প্রান্তিক হিন্দু সভা, পুণা, ১৯৬৩, পৃ ঃ ৪৬০)। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষ নিয়ে ভারতবাসীকে লড়তে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য পূরণের জন্য যখন নতুন সশস্ত্র ব্যাটেলিয়ান তৈরির সিদ্ধান্ত নিল তখন সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে একটা বড় সংখ্যক হিন্দু যুবকের নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। সেদিন হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য দেশের নানা প্রান্তে সহায়ক কেন্দ্র খুলেছিল যাতে হিন্দু যুবকেরা সহজেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে। এই বাহিনীকেই ব্রিটিশ পাঠিয়েছিল নেতাজি সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের হত্যা করতে। এরপরেও আরএসএস সদস্য নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ভাষণ দেবেন, আর তা দেশবাসীকে শুনতে হবে?

মনে রাখা ভাল, এই ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদনে হিন্দু মহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর লিখেছিলেন, " ...সরকার যদি তাদের বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে একটু মুক্ত করে দেন তবে আমি আর কিছু পারি বা না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকব। ...সরকার আমাকে যত কাজ করতে বলবে, সেই মতো প্রায় সব কাজ আমি করতে প্রস্তুত।" (পেনাল সেটলমেন্টস ইন আন্দামানস, আর সি মজুমদার, পৃ ঃ ২১১-১৩)।

বিজেপি নেতাদের চোখে ইনিই নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামের আইকন!

হিন্দুত্ববাদী এই সব সংগঠনের যেমন ব্রিটিশপ্রীতি ছিল অগাধ, তেমনি ছিল মুসলিম লিগেরও। হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের সাথে বাংলা, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা পরিচালনা করছিল। এর পিছনে যে ব্রিটিশ সরকারের মদত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ওই সময় সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনে (১৯৪২) সাভারকর বলেছিলেন, "বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা জানে যুক্তিসঙ্গত আপসের দ্বারাই আমাদের এগোতে হবে। এই যুক্তিসঙ্গত আপসের প্রমাণ হল সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে একত্রে সরকার চালানোর জন্য হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। ... ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পরিচালনায় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা সাফল্যের সাথেই চলছে" (সাভারকর সমগ্র— খণ্ড

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিলাসী নেতারা গরিবের দুঃখ কী করে বুঝবেন

বিজেপির তাবড় নেতারা, অমিত শাহ থেকে নাড্ডা, সকলেই প্রচারে গিয়ে মাঝে মাঝেই কোনও দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে পাত পাড়ছেন। তাই দেখিয়ে বিজেপির আইটি সেল 'বাহ বাহ' ধুয়ো তুলে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করছেন।

সত্যিই যদি কোনও দলের শীর্ষ নেতারা প্রচারে গিয়ে দরিদ্রের কুটিরে ওঠেন, তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নেন, তাঁদের সাথে একাত্ম বোধ করেন, চেষ্টা করেন তাঁদের দুঃখ দূর করার তবে তার থেকে আনন্দের আর কী আছে! অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভারত বিশ্বের প্রথম কয়েকটি দেশের মধ্যে থাকলেও সেই সমৃদ্ধির ভাগ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই পান না। দেশের বেশির ভাগ মানুষই গরিব। তেমন দেশের নেতাদের এমন আচরণ দৃষ্টান্তমূলক বৈকি!

কিন্তু যদি জানা যায়, দরিদ্রের কুঁড়েতে এই পাতপাড়ার মধ্যে কোনও আন্তরিকতাই নেই। এর সবটাই অভিনয়, শুধুমাত্র সাংবাদিক ফটোগ্রাফার, টিভি চ্যানেল নিয়ে গিয়ে প্রচারের জন্যই এমন কাজ, তবে কী মনে হয়? যদি জানা যায়, দরিদ্রের মাটির দাওয়ায় বসে ভোজন সেরে সেই নেতারাই ফিরছেন কোনও বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেলে এবং সেখানেই থাকছেন, তবে কেমন লাগে? সেটিই দেখা গেল সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংবাদে— নির্বাচনী প্রচারকাজ চালানোর জন্য বিজেপি মহানগরীর এক পাঁচতারা হোটেল ভাড়া নিয়েছে (দি টেলিগ্রাফ, ১৭ ফেব্রুয়ারি)। প্রথম সারির পাঁচতারা হোটেল 'হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল'-এর বেশ কিছু ঘর বিজেপি ভাড়া নিয়েছে নেতাদের থাকা এবং মিডিয়া সেন্টার পরিচালনার জন্য। বিজেপি সূত্রেই জানা গেছে, নেতাদের থাকার জন্য ভোটের আগে আরও কিছু হোটেলের ঘর, বিলাসবহুল রিসর্ট, দুটি আধুনিক মানের গেস্টহাউস ভাড়া নেওয়ার কথা।

দলের এক সদস্য জানিয়েছেন, মুরলীধর সেন লেনে পার্টির মূল অফিস ছাড়াও পার্টি বেশ কয়েক মাস আগেই দক্ষিণ কলকাতার হেস্টিংস এলাকায় একটি বাড়ির চারটি তলা ভাড়া নিয়েছে দলের কাজ পরিচালনার জন্য। ভোটের কাজ দেখার জন্যে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ জায়গাই রয়েছে। তিনি বলেছেন, জানি না, এর পরেও বিলাসবহুল হোটেল ভাড়া নেওয়ার কী দরকার পড়লো। এতদিন বাংলার বাইরে অন্য রাজ্যের ভোটে দল হোটেল ভাড়া নিত, এ বার বাংলাতেও সেই কালচারই আমদানি করা হল।

রাজ্য বিজেপির সোস্যাল মিডিয়া এবং আইটি সেল হেস্টিংসের এই বিল্ডিং থেকেই কাজ করে। এখানে প্রায় প্রত্যেক নেতার জন্যই, এমনকি তৃণমূল থেকে সদ্য আসা নেতাদের জন্যও নির্দিষ্ট ঘর রয়েছে। সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, প্রতিদিন এখানে কমপক্ষে ২৫০ জনের খাবার তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে।

গত বছর বিহার নির্বাচনেও বিজেপি এ ভাবেই পাটনার একটি হোটেলের একাংশ ভাড়া নিয়েছিল, যেখানে থেকে নেতারা ভোটের প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন। পার্টির মিডিয়া সেন্টারও সেখান থেকেই কাজ করেছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে এই প্রশ্ন উঠছে যে, নির্বাচনী প্রচারে নেতাদের জন্য এমন বিলাসবহুল হোটেলের প্রয়োজন কী? এর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার তাই বা কোথা থেকে আসছে? এই বিপুল পরিমাণ টাকা কি জনগণের থেকে চাঁদা হিসাবে সংগ্রহ করা হয়? দেখা যাক।

২০১৪ সালের নির্বাচনেই দেশের মানুষ প্রথম দেখেছিল, বিজেপি কি অবিশ্বাস্য পরিমাণ টাকা নির্বাচনে খরচ করে। সেই নির্বাচনে টাকার স্রোত বয়ে গিয়েছিল। ২০১৯-এর নির্বাচনেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এত টাকা তো জনগণের থেকে চাঁদা হিসাবে আসতে পারে না। তা হলে? দেখা যাচ্ছে, কর্পোরেট সংস্থাগুলি এখন বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা দেয়। এই দেওয়াটাকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে বড় বড় দলগুলির স্বার্থেই। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে বিজেপি কর্পোরেট থেকে মোট পেয়েছে ৪০০ কোটি টাকা। যা মোট কর্পোরেট ডোনেশনের ৯২ শতাংশ। বছর দশেক আগে নির্বাচনে টাকা ঢালার জন্য কর্পোরেট সংস্থাগুলি নির্বাচনী ট্রাস্ট তৈরি করেছে। ওই আর্থিক বছরে এই ট্রাস্ট থেকেও বিজেপি পেয়েছে বিপুল পরিমাণ টাকা। প্রুডেন্ট নির্বাচনী ট্রাস্ট ১৪৪ কোটি টাকা দিয়েছে বিজেপিকে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪ থেকে এই সংস্থাটি শুধু বিজেপিকেই দিয়েছে ৫৯৪ কোটি টাকা। এতেই শেষ নয়। এর পরেও রয়েছে ইলেকটোরাল বন্ডে টাকা আমদানির হিসেব। শিল্পসংস্থাগুলি ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলিকে টাকা দেয়। যার সবই বড় অঙ্কের। ২০১৮-তে এই মাধ্যমে বিজেপি পেয়েছে ২১০ কোটি টাকা। এ এখন কোনও গোপন খবর নয়। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর। উপরের তথ্যগুলি অনলাইন সংবাদমাধ্যম 'দি প্রিন্ট'-এর ৫ মে ২০১৯ থেকে নেওয়া।

তা হলে যে দল শিল্পপতি-পুঁজিপতি-কর্পোরেট সংস্থার থেকে এ ভাবে দেদার টাকা পায় তারা কি তাদের বাদ দিয়ে জনগণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে পারে? এই সব শিল্পপতি-কর্পোরেটদের শোষণের হাত থেকে জনগণকে রেহাই দেওয়ার জন্য লড়াই করতে পারে? এই যে লক্ষ কোটি টাকা ভোটের পিছনে বিজেপির মতো দলগুলি খরচ করছে এতে কি জনগণের সত্যিকারের কোনও মঙ্গল আছে? করোনা অতিমারির কারণে কাজ হারিয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন যখন বিপর্যস্ত তখন নেতাদের এত বিলাসিতা, টাকার এমন নয়ছয় অত্যন্ত অমানবিক নয় কি! আসলে এইসব দলের

সাতের পাতায় দেখুন

ষষ্ঠ বেতন কমিশনই হয়নি বিজেপি দিচ্ছে সপ্তম বেতন কমিশনের প্রতিশ্রুতি

সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের যে প্রতিশ্রুতি বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারে দিয়েছে, তা কর্মচারীদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ঠুর উপহাস। এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস। তিনি বলেন, মহার্ঘভাতা কর্মচারীদের একটি অধিকার, দয়ার দান নয়। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই একে দান হিসাবে দেখাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আগের সব সরকারগুলির মতো বর্তমান সরকারও মহার্ঘভাতা বকেয়া রেখেছে। তাই, শুধু কেন্দ্রীয় হারে নয় প্রাপ্য দিন থেকে বকেয়া সহ মহার্ঘভাতা দিতে হবে।

তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সময় এ রাজ্যে প্রথম বেতন কমিশন গঠিত হয়। একইভাবে কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনের সময় রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠিত হয়েছে। যুক্তিযুক্তভাবেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বেতন সংশোধন এবং বকেয়া সহ সমস্ত আর্থিক সুবিধা দাবি করেছেন, তারা সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের দাবি করেননি। এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের ন্যায্য দাবিগুলির ধার পাশ দিয়ে না গিয়ে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের বিভ্রান্তিকর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।

তিনি বলেন, এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা এই প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন

২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব মেদিনীপুরে মেচেদার বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবনে। স্যাট-এর রায় মেনে বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান, পঞ্চায়েত কর্মচারীদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধি সাপেক্ষে স্থায়ীকরণ, সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, দুর্নীতি রুখতে ফিনান্সিয়াল রুলের কঠোর প্রয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্থায়ী কর্মচারীরা ছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক পঞ্চায়েত কর্মচারী, ট্যাক্স কালেক্টর, নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধীনে বাল-সহায়িকা ও গৃহ-সহায়িকা এবং সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কমরেড সুনির্মল দাসকে সভাপতি ও কমরেড শুভাশিস দাসকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ২০ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

হাওড়ার বাগনানে নির্বাচনী প্রচার

মোদি বিরোধী বিক্ষোভে গুলি

বাসদ (মার্কসবাদী)-র তীব্র নিন্দা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২৬ মার্চ সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে মোদি বিরোধী বিক্ষোভে গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করেছেন। রাজধানী ঢাকায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামি সংগঠনগুলোর মোদি বিরোধী বিক্ষোভে ছাত্রলিগ-যুবলিগের হামলা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে চারজনের হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্যতম হোতা, ফ্যাসিস্ট নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকার বাংলাদেশের যে কোনও নাগরিকের আছে। সেই বিক্ষোভকে দলীয় ক্যাডার ও পুলিশ দিয়ে দমন করার অপচেষ্টার মাধ্যমে আওয়ামি লিগ সরকার তার ফ্যাসিবাদী চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। ছাত্রলিগ-যুবলিগ ক্যাডাররা সাংবাদিকদের ওপরও বর্বর হামলা চালিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের মোদি বিরোধী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে একই কায়দায় হামলা-বাধাপ্রদান করেছে ছাত্রলিগ ও পুলিশ।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে এক সাম্রাজ্যবাদী, খুনি ও ফ্যাসিস্ট নায়ককে আমন্ত্রণ, প্রতিবাদ সমাবেশে হামলা ও গুলি করে হত্যা করা এবং সমস্ত প্রচারযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই খবরও চাপা দেওয়ার চেষ্টা বাস্তবে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে গর্হিতভাবে অপমান করার সামিল।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, আজকের আন্দোলনকারীদের সাথে আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত মতপার্থক্য থাকলেও তাদের ওপর গুলি চালিয়ে হত্যার আমরা প্রতিবাদ জানাই এবং গুলিবর্ষণের জন্য দায়ীদের বিচার দাবি করি।

বিহারে পুলিশি রাজ কায়েম করছে বিজেপি জোট সরকার

তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

বিহারে বিজেপি জোট সরকার যে স্পেশাল পুলিশ বিল-২০২১ এনেছে তার বলে পুলিশ অফিসারদের ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও স্থানে এবং বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি করতে পারবে ও যাকে খুশি গ্রেপ্তার করতে পারবে। কোনও আদালত পর্যন্ত পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এই চরম অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরতান্ত্রিক আইনের বিরুদ্ধে বিধানসভায় যে বিরোধী সদস্যরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, ২৩ মার্চ পুলিশ দিয়েই তাঁদের বিধানসভা থেকে বার করে দিয়েছে বিজেপি সরকার।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং ২৪ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, এই আইন বিহারে পুলিশি রাজ কায়েম করবে। তিনি বলেন, এই দানবীয় ফ্যাসিস্ট আইনের বলে আদালত এবং আইনের শাসনের বদলে পুলিশই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হবে।

কমরেড অরুণ সিং বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পথেই বিহারে বিজেপি-জেডিইউ সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, চরম হারে বেড়েছে। দুর্নীতি, তোলাবাজি, ঘুষ ইত্যাদি অপরাধের গ্রাফ তীব্র গতিতে উর্ধ্বগামী।

এর বিরুদ্ধে জনগণের মনে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ বাড়ছে। এই ধূমায়িত বিক্ষোভকে লাঠিগুলি দিয়ে দমন করার জন্য পুলিশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চাইছে বিজেপি সরকার। এর ফলে আজও টিকে থাকা গণতন্ত্রের অবশেষটুকুও বিলুপ্ত হবে।

বিহার স্পেশাল পুলিশ আইন-২০২১ বাতিলের দাবি জানিয়ে কমরেড অরুণ সিং আরও বলেন, বিধানসভায় বিরোধী বিধায়কদের উপর পুলিশি হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

কৃষকদের দাবি মেনে নাও, ২৬ মার্চ ভারত বনধে গর্জে উঠল দেশ

বাঁদিকে এআইকেকেএমএস এবং এআইইউটিইউসি-র বিক্ষোভ মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে। ডানদিকে উপরে কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে এআইইউটিইউসি সহ শ্রমিক সংগঠনগুলির বিক্ষোভ

পাঁচ মাস ধরে দিল্লির সীমান্তে অবস্থান করে নিজেদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারকে শোনানোর চেষ্টা করে চলেছেন দেশের কৃষক সমাজ। কিন্তু এ সরকার এতটাই অগণতান্ত্রিক, এতটাই নিষ্ঠুর-নির্মম যে আন্দোলনের ময়দানে আড়াইশোর বেশি কৃষকের মৃত্যুর পরেও তারা কোনও আলোচনাই করতে নারাজ। কর্পোরেট পুঁজিমালিক ধনকুবেরদের কাছে তাদের স্বার্থ রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করেছে তার থেকে এতটুকু সরবার ইচ্ছা তাদের নেই। বিজেপি সরকার ভেবেছে, কর্পোরেট পুঁজি মালিক প্রভুদের পাশে পেলেই তার ভোট বৈতরণী পারের পারাণি জোগাড় হয়ে যাবে। জনগণের কোনও কণ্ঠস্বরকেই তারা তোয়াক্কা করতে নারাজ। সরকার ভাবছে, টাকার জোর, প্রচারের জোর, প্রশাসনের চোখরাঙানি, মিথ্যা মামলা এই সবের জোরেই আন্দোলনকে ভেঙে দিতে পারবে তারা।

কিন্তু তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে কৃষকরা অনমনীয় দৃঢ়তায় তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে গিয়ে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, কত তাকত তোমার পুলিশ-মিলিটারি-আমলাতন্ত্রের আছে, দেখাও, দেখাও তোমার টাকার জোরে বাঁধা পড়া মিডিয়ার তাকত। আর দেখে নাও জনগণের আন্দোলনের তাকত। সংযুক্ত কিসান মোর্চা ডাক দিয়েছিল ২৬ মার্চ ভারত বনধের। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সারা ভারতে কৃষক-শ্রমিকরা বনধ সফল করতে রাস্তায় নামলেন ওই দিন। কিসান মোর্চা নেতৃত্ব ঘোষণা করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ যে পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন, সেগুলি বনধের আওতার বাইরে থাকবে।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ২৩ মার্চ বনধের সমর্থনে প্রচারের পাশাপাশি শহিদ ভগৎ সিংয়ের ছবি নিয়ে মিছিলে সামিল হয়েছিলেন বিশাল সংখ্যক মানুষ। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় হয় মশাল মিছিল। ২৬ মার্চ মধ্যপ্রদেশের বেশিরভাগ রেল জংশন, উত্তরপ্রদেশের রেল স্টেশন, জাতীয় সড়ক, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানের বহু জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বনধ সমর্থকদের পিকেটিংয়ে। দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ সহ নানা স্থানে রেল অবরোধ ও রাস্তা অবরোধ হয়। এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি এবং সংযুক্ত কিসান মোর্চার অন্যতম নেতা কমরেড সত্যবান বলেন, এই বনধ সরকারকে একটা হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল। এরপরও সরকার দাবি না মানলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

ভারত বনধের দিন বাঙ্গালোরে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

পাঠকের মতামত

মান্ডি চালুর কথা বলুন

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অর্ধেকেরও বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেই কৃষকদের সমস্যা নিয়ে ভোটপ্রার্থীদের কোনও হেলদোল নেই। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির জায়গা হল কিসান মান্ডি। রাজ্যের জেলাগুলির বেশ কিছু ব্লকে সরকারি অর্থে তৈরি হয়েছে সেই কিসান মান্ডি। কিন্তু বেশিরভাগ মান্ডি এখনও চালু না হওয়ায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারছে না মান্ডিতে। সে কারণে বিভিন্ন জাতীয় ও রাজ্য সড়ক এবং রেলস্টেশন সংলগ্ন স্থানে কৃষকরা তাদের ফসল রোদ-বৃষ্টিকে মাথায় করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে কৃষিজ বিপণন দপ্তরেরও কোনও হেলদোল নেই।

রাজ্যে এখন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে প্রতিশ্রুতির বান ছোটাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কিন্তু তারাও কৃষকদের এই সমস্যা নিয়ে উদাসীন।

নারায়ণ চন্দ্র নায়ক
পূর্ব মেদিনীপুর

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের দেওয়াল লিখন

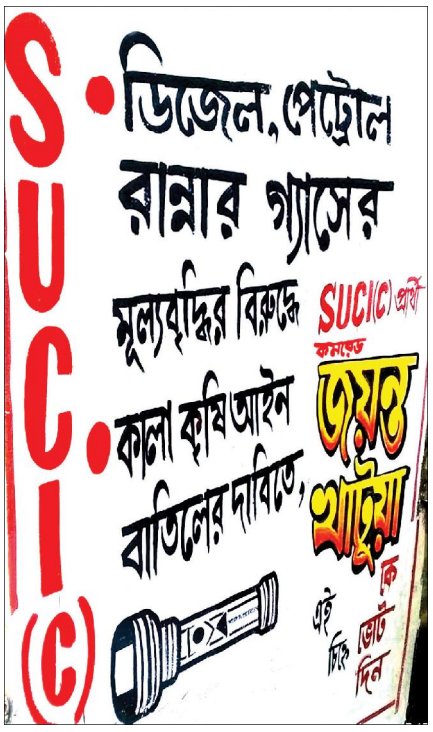

চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কুৎসা বিজেপির

বলির পাঁঠা ডাক্তার। দশচক্রে ভগবান ভূতের মতো অবস্থা, রাজ্যের ডাক্তারদেরও। এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি একটি ভিডিও প্রচার করছে। তাতে নানা জনের বয়ানে শোনানো হচ্ছে, এ রাজ্যের হাসপাতালে চিকিৎসক থেকে শুরু করে ওয়ার্ড বয় পর্যন্ত সকলেই ঘুষ নেওয়ার মাস্টার। তাদেরকে তোলাবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ, পিশাচ ইত্যাদি নানা বিশেষণে ঘৃণা উগরে দেওয়া হচ্ছে।

এ কথা ঠিক, হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে রাজ্যের মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। এর কারণ চিকিৎসার পরিকাঠামোগত অভাব। একটা জরুরি পরীক্ষা করাতে গিয়ে যদি দেখা যায় তারিখ মিলল কয়েক মাস পরে, অথচ কিছু টাকা ঘুষ দিলেই জলদি হয়ে যায় তা হলে ক্ষোভ তো হবেই। এর জন্য কে দায়ী? যিনি ঘুষ নিয়ে পিছন দরজা দিয়ে কাজটা করে দিলেন, তিনি তো সরাসরি দায়ী। কিন্তু কয়েক মাস পরে পরীক্ষার তারিখ পড়ল কেন? কেন দিনের পরীক্ষা দিনে হচ্ছে না? এর কারণ কী? এর কারণ হল ল্যাবরেটরির অভাব, যারা পরীক্ষা করবেন, সেই স্টাফের অভাব, অভাব ডাক্তারদের। এগুলি পূর্ণ করার দায় কার? ডাক্তার নার্সরা কি এই পরিকাঠামো গড়ার দায়িত্বে, না তা গড়ার দায়িত্ব সরকারের? সরকার এই দায়িত্ব পালন তো করছেই না, বাড়তি সমস্যা হল দুর্নীতিচক্র চলছে নানা রাজ্যে এবং কেন্দ্রের শাসকদলের প্রভাবশালীদের মদতেই।

একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক। দেশের ৯২ শতাংশ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৮৮ শতাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৮৭ শতাংশ ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসার পরিকাঠামো ইন্ডিয়ান পাবলিক হেল্‌থ স্ট্যান্ডার্ডস-এর নিচে অবস্থান করছে। সরকারি হাসপাতালে বেডের সংখ্যা প্রতি হাজার মানুষ প্রতি থাকার কথা ন্যূনতম তিনটি, সেখানে রয়েছে ০.৭ অর্থাৎ ১-এর কম। এই ঘাটতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পূরণ করে না বলে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অর্থের জোরে অন্যদের বঞ্চিত করে পিছন দরজা দিয়ে সুবিধা নেন। এর জন্য ডাক্তার নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের একতরফা দায়ী করলে সরকারের অপদার্থতা আড়াল করা হয়।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম ও মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। কেন সরকারি হাসপাতালকে এমন দুয়োরানী করে রাখা? কারণ, বেসরকারিকরণ, নার্সিংহোমের ব্যবসা বাড়াতেই সরকারের এই অবস্থান। আসল কারণ ঢাকতেই বিজেপি ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে লোক খ্যাপাতে চাইছে।

জেলায় জেলায় নির্বাচনী মিছিল

কোচবিহারের নাটাবাড়ি ও তুফানগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থীরা মনোনয়ন দিতে যাচ্ছেন

জলপাইগুড়ির পাঁচটি কেন্দ্রের প্রার্থীরা মিছিল করে মনোনয়ন দিতে যাচ্ছেন

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীরা উদযাপন করবে ৭৫ বর্ষ!

তিনের পাতার পর

৬, পৃঃ ৭৯-৮০)।

এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য তৈরি হয়নি। সাভারকরের 'পরম শ্রদ্ধেয়' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেছিলেন, "এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় জাতীয় গভর্নমেন্ট এমনভাবে গঠিত হবে যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়" (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ, পৃঃ ১১৬)।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি মনে করি না, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের সহায়তা হবে" (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়; শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, পৃঃ ৬১)। ভারত ছাড়ো আন্দোলন শ্যামাপ্রসাদের কাছে 'অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা' ও 'নাশকতামূলক' কাজকর্ম।

এখানেই শেষ নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল, সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করার জন্য ঘোষণা করলেন, "বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটা গৃহবাহিনী গঠনের অধিকার আমাদের দেওয়া হউক" (রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লিখিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পত্র থেকে উদ্ধৃত)। এই হল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভূমিকা! হিন্দু মহাসভা থেকে 'জনসংঘ' গড়ে তুলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, আর সেই 'জনসংঘ' থেকেই জন্ম 'বিজেপি'-র। সেই বিজেপিই আজ দেশপ্রেমের ধ্বনি তুলছে। যে নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হিন্দুদের আহ্বান জানিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, তাদেরই উত্তরসূরি বিজেপি আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন করছে। এটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কী?

শুধু পরাধীন ভারতেই নয়, বর্তমানে শাসক বিজেপির ভূমিকা চূড়ান্ত জনবিরোধী। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী তৎপরতা চলছে, ধর্মনিরপেক্ষতার উপর, সংখ্যালঘু জনগণের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে তা খুবই বিপজ্জনক। একই সাথে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে জনগণের উপর নানা অন্যায় জুলুম চলছে। হরণ করা হচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার। এই অপশক্তিকে নির্বাচনে পরাস্ত করাই নয়, এদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম তীব্র করা জরুরি।

প্যারাগুয়ের আন্দোলন শাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়ে এখন খবরের শিরোনামে। তিন দিকে ব্রাজিল, বলিভিয়া এবং আর্জেন্টিনা পরিবৃত ছোট্ট দেশ প্যারাগুয়ে। করোনা অতিমারিতে সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতা ও ব্যর্থতার প্রতিবাদে নাগরিকদের লাগাতার বিক্ষোভ চলছে। ৫ মার্চ পুলিশ প্রতিবাদকারীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে, ১৮ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে প্রেসিডেন্ট মারিও আবদো আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কয়েক জন মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্যারাগুয়ে সরকার করোনা মোকাবিলায় লকডাউন ঘোষণা করে বাইরের দেশ থেকে আসা-যাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ করে, আক্রান্তদের বা তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের জন্য কোয়ারেন্টিন নির্দিষ্ট করেছিল। তাতে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে ছিল অতিমারি। পরে পুঁজি মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখতে গিয়ে সমস্ত পদক্ষেপ শিথিল করে দেয় আবদো সরকার। প্রেসিডেন্ট আবদোর কলরাডো পার্টি যে সব শিল্পপতি গোষ্ঠীর টাকায় চলে, তাদের নির্দেশেই এই ব্যবস্থা। দেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি আমদানি-রফতানির ব্যবসা, এ ছাড়া ট্যুরিজম, খনি, নির্মাণ শিল্প— এই সমস্ত ক্ষেত্রে পুঁজি মালিকদের মুনাফা-লালসা মেটাতেই জনস্বার্থকে বলি দেয় প্যারাগুয়ে সরকার। যার ফলে আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যায়। প্যারাগুয়ের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার অভাব দেখা দিতে থাকে। আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় হাসপাতালগুলিতে বেডের সংকট দেখা দেয়। নাগরিকরা বেসরকারি হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। সেখানে চিকিৎসা খরচ ও ওষুধের ব্যয় বিপুল। কোনও কোনও পরিবার দিনে ৩০০ ডলার অর্থাৎ ২১ হাজার টাকারও বেশি ওষুধের পিছনে খরচ করতে বাধ্য হয়েছে। হাজার হাজার ডলার চিকিৎসার বিল মেটাতে অনেক রোগীর পরিবার ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করতে অথবা বন্ধক দিতে বাধ্য হয়। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চরম দুর্নীতি আর মুনাফাভিত্তিক ব্যবসায়িক স্বাস্থ্য পরিষেবা বিপর্যয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। ভারতবাসীর দুর্দশার সাথে কতই না মিল!

প্রয়োজনীয় সংখ্যায় আইসিইউ-এর ব্যবস্থা নেই। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে ভ্যাকসিন মজুত করার প্রতিযোগিতায় প্যারাগুয়ে সরকার অনেকটাই পিছিয়ে। রাশিয়া থেকে আনা ভ্যাকসিন জনসংখ্যার (৭১ লক্ষের কিছু বেশি) তুলনায় অত্যন্ত কম, মাত্র চার হাজার। ফলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। বহু জন পদত্যাগ করেছেন, যার মধ্যে দেশের বিখ্যাত ন্যাশনাল রেসপিরেটরি ইলনেস ইনস্টিটিউটের প্রধান পর্যন্ত রয়েছেন।

ব্যাপক গণবিক্ষোভে ভীত সরকার

সমস্ত বিক্ষোভের মিলিত ফল এই গণবিক্ষোভ। রাজধানী সানসিয়নে ৫ মার্চ বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হয়। বিক্ষোভের চাপে পড়ে প্রেসিডেন্ট আবদো রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন। তাতে বিক্ষোভের আগুন কিছুমাত্র কমেনি। 'আমি

প্যারাগুয়েবাসীর জন্য, ২০২১'— সোসাল মিডিয়ার এই হ্যাশট্যাগের প্রচারে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথে নামেন হাজার হাজার মানুষ। আবদো সরকার পুলিশ লেলিয়ে দেয় বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু নির্বিশেষে প্রতিবাদকারীদের উপর। টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট চালিয়েও আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করতে পারেনি প্রশাসন। রাস্তার দখল নিয়ে নেয় আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনের মেজাজ এমন ছিল, কোথাও কোথাও পুলিশকে হঠে গিয়ে সাদা পতাকা ওড়াতে দেখা যায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'এটা ভেনেজুয়েলার ষড়যন্ত্র' বলে আন্দোলনকে দাগিয়ে দিতে চাইছেন। কিছুদিন আগে ইকুয়েডরে শাসক মোরেনো এবং চিলির শাসক পিনেরা সরকারবিরোধী আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে এ ধরনের নানা 'চক্রান্তের' গল্প ফেঁদেছিল। দেখা গেছে সব দেশের শাসক বুর্জোয়াদের এই জায়গায় একটা অদ্ভুত মিল। ভারতেও তাই। দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট, খালিস্তানিদের চক্রান্ত ইত্যাদি বলে বদনাম দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এতে কোথাওই আন্দোলন স্তিমিত হয়নি। প্যারাগুয়েতেও আন্দোলনের চাপে প্রেসিডেন্ট আবদো তিনজন মন্ত্রীর পদত্যাগের কথা জানান। রাজধানীর পথে হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে এসে স্লোগান তোলেন— একজন মন্ত্রীকেও আমরা চাই না, এই সরকারকেও আমরা চাই না। ওই দিনও পুলিশ ব্যাপক অত্যাচার চালায় ও গ্রেপ্তার করে।

বিরোধী লিবারাল পার্টির নেতা পূর্বতন প্রেসিডেন্টের শাকরেদরা শাসক কলরাডোদের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত। কিন্তু কলরাডো পার্টির মতোই সাধারণ মানুষের দুর্দশা নিয়ে তাদের কোনও উদ্বেগ নেই। কলরাডো গত ৮০ বছর ধরে ক্ষমতাসীন (এর মধ্যে টানা ৩৫ বছর একনায়কতন্ত্র চলে)। অল্প কিছুদিনের জন্য বামপন্থী লুগো ক্ষমতায় এলেও ইমপিচমেন্ট করে সেই সরকার ফেলে দেওয়া হয়। পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত দল এই কলরাডো পার্টি। লিবারাল পার্টিও পুঁজিপতিদের আরেকটি বিশ্বস্ত দল, ভারতের ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বিজেপির মতো। একের বদলে আরেক দল ক্ষমতায় বসলেও শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার কোনও পরিবর্তন হয়নি। প্যারাগুয়েতেও না, ভারতেও নয়।

রাস্তাতে থেকেই লড়াইয়ের শপথ

ক্ষমতায় থাকা নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি এবং অতিমারিতে শত শত মানুষের মৃত্যুতে প্যারাগুয়েবাসীর ক্ষোভ মাত্রাছাড়া হয়। বিক্ষোভ ফেটে পড়ে দেশের নানা স্থানে।প্যারাগুয়ের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য দায়ী এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, আর এই ব্যবস্থাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে ক্ষমতাসীন দলগুলি— এ সত্য আর আড়াল করা যাচ্ছে না। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতো এখানকার পুঁজিপতিরাও চায় অর্থনৈতিক সঙ্কটের অজুহাত দিয়ে শ্রমিক-কৃষকদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করতে। বিপরীতে নিজেদের পুঁজির পাহাড় আরও বাড়িয়ে তুলতে। তাই শ্রমিক-কৃষক সহ জনসাধারণ বিকল্প সরকার গড়ার ডাক দেয়। দেশের 'অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে' পুঁজিপতিদের সাথে শ্রমিক-কৃষককে হাত মেলানোর ডাক দিয়েছিলেন সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা। এটা পুঁজিপতিদের সাথে আপস করানোর একটা অপচেষ্টা বলে মনে করছেন শ্রমিক-কৃষকরা, তাই সেই ফাঁদে তারা পা দিচ্ছেন না।

বর্তমানে সরকার অপসারণ এই আন্দোলনের ডাক। এর জন্য প্রতি পাড়ায়, কারখানায়, যুবকদের মধ্যে সভা, গণসমাবেশ সংগঠিত হচ্ছে। আন্দোলনকে আরও সুসংহত করতে বামপন্থী সংগঠনগুলিও রয়েছে তাদের যথাযথ শক্তি নিয়েই। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে নানা দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের দাবি উঠছে

২০১৯ সাল থেকে লাতিন আমেরিকায় বারবার ফেটে পড়ছে মানুষের বিক্ষোভ— অক্টোবরে ইকুয়েডরে আন্দোলন, ওই বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বরে চিলিতে প্রবল বিক্ষোভ, ২০২০-র সেপ্টেম্বরে কলোম্বিয়ায় ন্যাশনাল স্ট্রাইক, নভেম্বরে পেরুতে গণআন্দোলনের জেরে দু'বার সরকার পতন, ওই মাসেই গুয়াতেমালায় সংসদ ভবন অগ্নিকাণ্ড, হাইতিতে মৌসে সরকারের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দু'মাস ধরে লাগাতার গণবিক্ষোভ পথ দেখিয়েছে প্যারাগুয়েকে। সব দেশেই আওয়াজ উঠছে, পুঁজিবাদ নিপাত যাক।

লাতিন আমেরিকার এই দেশগুলি যেন এক একটা বারুদের স্তূপ। বেকারি, দারিদ্রে জর্জরিত দেশগুলিতে অতিমারি সেই বারুদে আগুন নিক্ষেপ করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল করোনা অতিমারি। কি ভারত, কি প্যারাগুয়ে মানুষের তীব্র সংকটে বিক্ষোভের পারদ চড়ছে। দরকার বিপ্লবী নেতৃত্বের, যারা সমাজের নিষ্পেষিত অবহেলিত মানুষের নেতৃত্বে বসাবে শ্রমিক শ্রেণিকে।

বিলাসী নেতা

চারের পাতার পর

নেতারা এমন ভাবে জীবনযাপনেই অভ্যস্ত। বিমান ছাড়া চড়েন না, বিলাসবহুল হোটেল না হলে চলে না, দামী খাবার ছাড়া মুখে রোচে না। কিন্তু যে নেতারা এমন জীবনে অভ্যস্ত তাঁরা কি জনগণের নেতা? তাঁদের সঙ্গে কি জনগণের সুখ-দুঃখের সত্যিই কোনও যোগ আছে? এই সব নেতারাই নাকি শোষিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত সব মানুষের জীবনে আচ্ছে দিন নিয়ে আসবেন! যে সব সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ তৃণমূলের সম্পর্কে হতাশ হয়ে এই সব নেতাদের পিছু পিছু ছুটছেন, তাঁদের ভেবে দেখা দরকার, তাঁরা মরীচিকার পিছনে ছুটছেন না তো! ফুটন্ত কড়াই থেকে বাঁচতে গিয়ে জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়বেন না তো! কোনও রকম বিচার না করে একদিন কংগ্রেসের পিছনে ছুটেছিলেন, তারপর সিপিএমের পিছনে, তারপর তৃণমূলের। এখন আবার ছুটছেন বিজেপির পিছনে। বরং আসুন, রাজনীতির ভালমন্দ, নীতির ভালমন্দ, দলের ভালমন্দ বিচার করে বুঝে নিই সত্যিকারের শোষিত মানুষের, মেহনতি মানুষের, সাধারণ মানুষের দল কোনটা। তার পাশে দাঁড়াই। তাকে শক্তিশালী করি।

মেখলিগঞ্জ কেন্দ্রের দেওয়াল লিখন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যর্থ বিজেপি সরকার

বাঙ্গালোরে বিশাল মিছিল

জ্বালানির দাম প্রায় প্রতিদিন বাড়ছে। তিন মাসে গ্যাসের দাম ২০০ টাকার বেশি বেড়েছে। খাদ্যদ্রব্য, রান্নার তেল সহ সমস্ত নিত্যপণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। আর ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষকে কোনও সুরাহা না দিয়ে আম্বানি-আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ২ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দিল।

১৯ মার্চ বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে এক বিশাল জনসভায় ক্ষোভের সাথে এ কথাগুলি বলেন, এস ইউ সি আই (সি)-র কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে উমা। তিনি বলেন, লকডাউনে শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ কাজ হারিয়েছেন। আয় তলানিতে। মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে হাহাকার করছে। এর পরেও বিজেপি সরকার লক্ষ লক্ষ মানুষের রেশন কার্ড বাতিল করে দিয়েছে, আধার সংযুক্তি হয়নি— এই তুচ্ছ অজুহাতে। এদিন হাজার হাজার মানুষ সিটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে সুশৃঙ্খল মিছিল করে শহরের বিভিন্ন পথ ঘুরে ফ্রিডম পার্কে পৌঁছায়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড এম এন শ্রীরাম। মঞ্চে ছিলেন কমরেড এইচ ভি দিবাকর, রামানজানাপ্পা আলদালি, শশীধর, সোমশেখর, সুনীথকুমার প্রমুখ।

কেরালায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার

কেরালার চাঙ্গানাসেরি কেন্দ্রে দলের প্রার্থী কমরেড রাজিথা জয়রামকে নিয়ে প্রচার চলছে। কেরালার ৩৭টি কেন্দ্রে দলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন

নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কৃতিত্ব জনগণের, কোনও দল বা নেতার নয়

ঐতিহাসিক নন্দীগ্রাম আন্দোলনে পুলিশি গুলিচালনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যের কিছু রাজনৈতিক দল যেভাবে গতকাল বিভিন্ন ন্যক্কারজনক বক্তব্য রেখেছে, তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৯ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

"ঐতিহাসিক নন্দীগ্রাম আন্দোলন সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএমের নানা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, নন্দীগ্রামে তৎকালীন সিপিএম সরকার ব্যাপক সংখ্যক কৃষককে উচ্ছেদ করে কর্পোরেট সালেম গোষ্ঠীকে দিয়ে 'সেজ' গঠনের জন্য ষড়যন্ত্র করে।

সকলেই জানেন যে, এর বিরুদ্ধে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই কমিটির অন্যতম কনভেনর ছিলেন আমাদের দলের স্থানীয় নেতা নন্দ পাত্র। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চাই এই গণআন্দোলন দমনে সিপিএম সরকার বামপন্থাকে পদদলিত করে সশস্ত্র পুলিশ ও ক্রিমিনাল বাহিনী দিয়ে ব্যাপক গণহত্যা ও গণধর্ষণ করায়। এ ঘটনা সেখানকার জনগণ সকলেই জানেন। আজও সেই সব নির্যাতিত পরিবার শোক ও দুঃখ-বেদনা বহন করে চলেছে।

আমরা এ কথাও জানাতে চাই, এই আন্দোলনের কৃতিত্ব কোনও দল বা নেতার দাবি করা সম্পূর্ণ অনৈতিক। সেখানকার জনগণই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে এবং প্রাণের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত সিপিএম সরকারের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করেছে। এটা গণআন্দোলনেরই জয়। আমরা আবেদন করব এই আন্দোলনের বিষয় নির্বাচনের স্বার্থে কোনও দলেরই অপব্যবহার করা উচিত নয়। সকলেই জানেন আমাদের দল সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগ্রামী বামপন্থা ও গণআন্দোলনের লাইনের ভিত্তিতে একদিকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, জনবিরোধী কার্যকলাপ এবং অন্যদিকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।"

২৩ মার্চ ভগৎ সিং শহিদ দিবস উদযাপন

শহিদ ঈ-আজম ভগৎ সিং-এর শহিদ দিবস ২৩ মার্চ দেশের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় । এই উপলক্ষে শহিদ বেদিতে মাল্যদান, শহিদ স্মারক ব্যাজ পরিধান, আলোচনা সভা, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উপরে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি, নিচে কমসোমলের উদ্যোগে ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলায় ভগৎ সিং শহিদ দিবস পালিত হয়

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com